ত্রয়োদশ অধ্যায়

পাঠ্যক্রম
(Curriculum)

শিক্ষার উপকরণ (Contents of Education)

- পাঠ্যসূচী—(Course of study)
- শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা পুঞ্জ—(Educational experiences)
- পঠনীয় বিষয়গুলি—(Subjects to be studied)
- বিষয় বস্তু—(Subject matter)
- শিক্ষামূলক কার্যাবলী—(Educational activities)

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাঠ্যক্রম

পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন দিক

একটি জাতি বা দেশ পরিচিত তার জনগণের মধ্যে দিয়েই। মানুষ তৈরি করার জন্য যে সব শক্তিশালী উপাদান প্রয়োজন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট হল শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে। এই **যথার্থ শিক্ষা নির্ভর করে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ উপাদানের ওপর**, একটি হল **শিক্ষকের গুণ** আর অন্যটি হল **পাঠ্যক্রমের স্বরূপ বা প্রকৃতি** অর্থাৎ শিক্ষার উপকরণ। এই উপকরণ ছাড়া শিক্ষা নিরর্থক। পাঠ্যক্রম শিক্ষার বিশিষ্ট উপাদান, যা শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল—এই **পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বিশদ পরিচয় লাভ করা**। এ প্রসঙ্গে এসে পড়বে, শুধু কী পড়ানো হবে বা কোন্ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন করতে হবে, তাই নয়। **কেমন করে এই পাঠ্যক্রম পরিবেশিত হবে ও এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন হবে।** পাঠ্যক্রম আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও তাদের **প্রয়োজন, চাহিদার কথা** এসে পড়বে, তেমনই **শিক্ষার্থীর সমাজ-সংস্কৃতির** নানান দিক নিঃসন্দেহে আলোচনার বিষয় হবে। তাছাড়াও, **শিক্ষার চরম লক্ষ্য ও আপাত লক্ষ্য**, সেগুলির নিরিখে পাঠ্যক্রম রচনা ও পাঠ্যক্রমের বিবর্তনের ক্ষেত্রে **ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা, পাঠ্যক্রমের নানান ধরন, পাঠ্যক্রম রচনার বিভিন্ন নীতি** (Principles

এখন পাঠ্যক্রমের নতুন সংজ্ঞা

মুদালিয়ার কমিশনের বক্তব্য

পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (Evaluative Process)। পাঠ্যক্রম এখন আর পুঁথি সর্বস্ব বিদ্যা সংগ্রহ নয়, কিছু তথ্য আহরণ বা তথ্য বিশ্লেষণ নয়। পাঠ্যক্রম ব্যক্তি মানুষ ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা-গুলির একটি সংগঠিত রূপ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ অংশগ্রহণে পাঠ্যক্রম সার্থক হয়। Payne বলেছেন, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব সংগঠনের স্বার্থে তাদের আচরণ ধারার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিদ্যালয় সচেতন ভাবে যে বিভিন্ন পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতা নির্বাচন ক'রে সংগঠ. করবে, তাই পাঠ্যক্রম ("Curriculum consists of all the situations that the school may select and consciously organise for the purpose of developing the personality of its pupils and for making changes in their behaviour")। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতীয় শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে সংস্কার লক্ষ্যে গঠিত মুদালিয়ার শিক্ষা কমিশনের ভাষায়-শিক্ষা এখন আর বিদ্যালয়ের বিষয়গুলির চিরাচরিত প্রথায় অধ্যায়ন নয়, পাঠ্যক্রম বলতে বোঝায় শিক্ষার্থী নানান ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের যে যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, তারই যোগফল তা বিদ্যালয়ে থেকেও হতে পারে বা শ্রেণীকক্ষে, কি পাঠাগারে, ল্যাবোরেটরিতে, কি খেলার মাঠে, বা শিক্ষকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ সংযোগের ফলেও সম্ভব হয়। কারণ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র জুড়েই যে কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি (According to the best modern educational thoughts curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in schools but it includes the sumtotal of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, playgrounds and in the numerous informal contracts between teachers and pupils")। এইভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিক্ষা যা অভিজ্ঞতার সমষ্টি, তার মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং পাঠ্যক্রমের অনুশীলনের দ্বারা সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতি বিধান তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পাঠ্যক্রমকে ব্যক্তির প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত রূপ বলা হয় ("Curriculum in the resultant of the two forces—the needs of an individual and the aspirations of the society")। ১৯৬৪-৬৬ সালে গঠিত কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে— শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। শিক্ষার যোগ্যতম বাহক হল পাঠ্যক্রম, তাই পাঠ্যক্রম এমন হবে যা শিক্ষার্থীর জীবন - অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হবে, অন্যদিকে সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন চাহিদাকেও পরিপূরণ করবে। পাঠ্যক্রমের আধুনিক ধারণার বিশ্লেষণে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ— (১) শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশোপযোগী অভিজ্ঞতা পুঞ্জের সঞ্চয়ন,

(২) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম মানব জীবনের শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত কাজ ও অভিজ্ঞাতাগুলির সমন্বয়ন,

(৩) পাঠ্যক্রম শিক্ষার লক্ষ্যের সমান্তরাল হবার দরুণ পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনশীলতা এবং

(৪) শিক্ষার লক্ষ্যানুবর্তী পাঠ্যক্রমের বিশেষ দুটি দিকের অস্তিত্ব—একটি তাত্ত্বিক (theoretical) এবং অন্যটি প্রায়োগিক (practical)। **পাঠ্যক্রম জ্ঞান, অনুভূতি, কর্ম ও শিক্ষার্থীর কথা সমাজের চাহিদাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে**। শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। এই লক্ষ্যগুলির নির্দেশক হল—**ঐতিহাসিক** বিবর্তনের নানাদিক, **দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব**।এগুলিই শিক্ষার ও পাঠ্যক্রমের নির্ধারক। এখন আমরা পাঠ্যক্রমের ঐতিহাসিক, দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ্যক্রমের ভিত্তি
(Foundations of Curriculum)

(ক) ঐতিহাসিক ভিত্তি
(Historical Foundation)

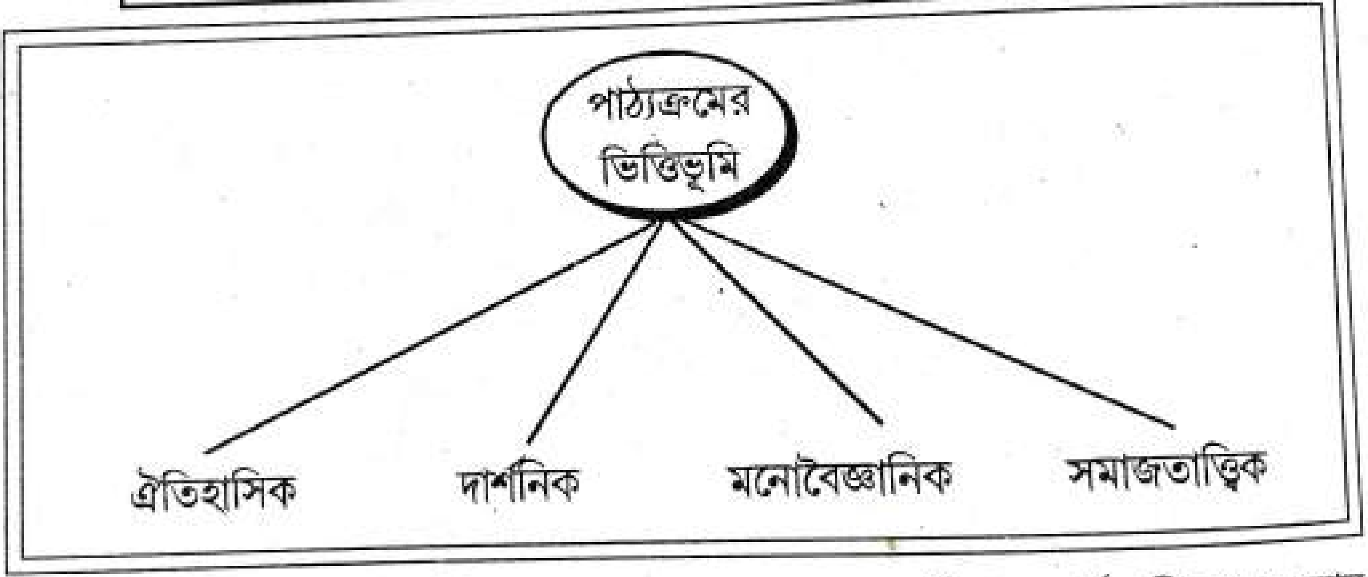

শিক্ষার লক্ষ্য

পাঠ্যক্রম রচনার জন্য **শিক্ষার লক্ষ্য অনুসরণ হল সর্বপ্রধান শর্ত**। শিক্ষা ও তার উপকরণ মানবসংস্কৃতির নানা ক্রম বিবর্তনের ধারার ফসল। প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার ইতিহাস বিশ্লেষণে ধরা পড়ে—পাঠ্যক্রম কেমন করে পরিবর্তনের প্রবাহে গড়ে উঠেছে।

প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগ

প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগে মানুষের কথা বলার ক্ষমতা, জানার শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করবার যোগ্যতা ছিল। তাদের আত্ম সংরক্ষণের তাগিদে জীবন যাপনের নানা কৌশল (skills) তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চালিত করত। এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া প্রথাগত ছিল না। এই প্রক্রিয়াই শিক্ষা প্রক্রিয়ার নামান্তর ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-৩০০০

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ৩০০০ পর্যন্ত সময় মিশরীয় সভ্যতার কাল। এই সময় ধাতুর ব্যবহার, লেখার সূত্রপাত দেখা গেল। লেখা (writing) শেখায়ও অনেকগুলি পদক্ষেপ অতিক্রম করতে হয়েছিল। ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে শব্দ প্রকাশ পেল। বস্তুর প্রতীক হিসেবে ছবি ব্যবহৃত হত। আস্তে আস্তে উচ্চারণ পদ্ধতি (phonetics, গড়ে উঠল। এই সময় ভাস্কর্য, চিত্রণবিদ্যা, সাহিত্য ইত্যাদির প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ আছে। তবে বিদ্যালয় বা সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ছিল বলে কোনো প্রমাণ নেই। তবে সংস্কৃতির ধারা ক্রমশ সঞ্চালিত হচ্ছিল প্রজন্মান্তরে। জনগণের দৈনন্দিন জীবন-অভিজ্ঞতাকেই পাঠ্যক্রম হিসাবে গণ্য করা হত। এই **সঞ্চালন প্রক্রিয়া স্বচ্ছন্দ** (informal) ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতক পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীক নগরীগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম ধারা একটি নির্দিষ্ট রূপ পেল। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হল স্পার্টা ও এথেন্স নগরীর দুটি বিপরীত ধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম। স্পার্টা সবসময় শত্রু রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত, ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ সেখানে নিত্যকার ঘটনা ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য রক্ষার জন্য বলিষ্ঠ দেহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মনবিশিষ্ট নাগরিক তৈরি করার লক্ষ্যে যুদ্ধ বিদ্যা অর্জন, দৈহিক সুস্থতা রক্ষা এবং বাধ্য নাগরিক হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়ে পাঠ্যক্রমে স্থান পেল। সেখানে বৌদ্ধিক বা নান্দনিক বিষয়ের কোনো স্থান ছিল না। শিক্ষার্থীর কোনো স্বাধীন ইচ্ছা মর্যাদা পেত না।

স্পার্টার পাঠ্যক্রমিক ধরন

এথেন্সের শিক্ষার বিকাশ হল বিভিন্ন পর্যায়ে এবং পাঠ্যক্রম বিকাশে (Curriculum Development) গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দেখা গেল। প্রমাণ আছে, মেয়েদের গৃহ পরিবেশে নৈতিক ও গার্হস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, আর ছেলেদের শিক্ষায় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হল পড়া, লেখা, গণিত, সঙ্গীত, গীতিকাব্য, বীণা বাজানো, শরীর শিক্ষা ইত্যাদি। ছেলেদের জন্য বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয় তিন ধরনের ছিল—(১) লেখা, পড়া ও গণিত শিক্ষার বিদ্যালয়, (২) সঙ্গীত ও শরীর শিক্ষার বিদ্যালয় এবং (৩) সৈনিক বিদ্যালয়।

এথেন্সের শিক্ষার পাঠ্যক্রম

খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৯-এর পরের পারস্য যুদ্ধের শেষে গ্রীক শিক্ষার ধারায় এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিল। লেখা, পড়া, মন্ত্রপাঠ, গণিতশিক্ষা আরও উন্নত ধরনের হল—এগুলির ৭ থেকে ১৩ বছর বয়স্কদের শেখানো হত। **সফিস্ট (Sophists)**-রা এর সঙ্গে যোগ করলেন ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা ও অলংকার শাস্ত্র (rhetoric)। ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স্কদের জন্য পাঠ্যক্রমে থাকত জ্যামিতি, অঙ্কন, সঙ্গীত, ব্যাকরণ ও অলংকার বিদ্যা। ১৬ বছর বয়সে শুরু হত উচ্চ শিক্ষার স্তর, সেই স্তরে থাকত মূলত অলংকার ও দর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমে যুক্ত হল বিজ্ঞান ও অঙ্ক। এই সময়ে শিক্ষায় বিশেষীকরণের সূত্রপাত দেখা গেল। **দর্শন** থেকে জ্যোতির্বিদ্যায়, জ্যামিতিতে ও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষার সুযোগ গড়ে উঠল।

সফিস্ট

সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিসটট্‌ল শিক্ষা সংস্কারে, পাঠ্যক্রমিক বিকাশে অনেক সদর্থক

ইউরোপে তিন ধরনের বিদ্যালয়

ইউরোপে তিন ধরনের বিদ্যালয় দেখা গেল — **ক্লাসিক্যাল** এবং **নন-ক্লাসিক্যাল** এবং উভয়ের মিশ্রণে গড়ে উঠল **জিমন্যাসিয়াম**। সেখানে পড়ানো হত ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রুভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও অঙ্ক। এই বিদ্যালয় বৈতনিক বা **paying schools** ছিল। এর পরের স্তরের স্কুলের নাম ছিল **Burgher Schools**। এগুলিতে গরিব ছেলেমেয়েরা পড়ত। এখানে পাঠ্যসূচীতে ছিল পড়া, লেখা, গণনা করা, গান, ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল ও জীববিজ্ঞান। এর পরের স্তরের বিদ্যালয়কে **Pedagogium** বলা হত। এগুলি অভিজাত শ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছিল। **১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে Real Schoole** শিক্ষার্থীদের অনেক চাহিদা পরিপূর্ণ করত।

অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত

অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত শিক্ষা জগতের নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে পাঠ্যক্রমিক পরিবর্তন নতুন নতুন মাত্রা পেয়েছে। বৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা সমৃদ্ধ ব্যক্তি—'কেন্দ্রিক নানান দিকে পাঠ্যক্রম শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে।

পাঠ্যক্রমের দার্শনিক ভিত্তিভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠ্যক্রমের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে ওই শতকগুলির ভাবধারার প্রতিফলন কতখানি তা আলোচনা করা যাবে।

(খ) পাঠ্যক্রমের দার্শনিক ভিত্তিভূমি
(Philosophical Foundation of Curriculum)

দর্শনের প্রভাব

দর্শন সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান শাখার জনক। দর্শন মানুষকে জগৎ জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে ও মানব মনের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা গড়ে তোলে। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন প্রভাবিত হয় দর্শনের দ্বারা, তেমনি **শিক্ষার উপকরণ নির্বাচনেও দর্শনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ**। দর্শনই **বিশ্ব-বীক্ষা** (World-View) সৃষ্টি করে। **তথ্য থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা থেকে চর্চা** (From Information to knowledge, from knowledge to wisdom, from wisdom to capacity) —এই যে উত্তরণ প্রক্রিয়া, তা তো দর্শনেরই ফসল। আজ সর্বত্র দর্শনের দারিদ্র্য (Poverty of Philosophy), তাই শিক্ষা, কৃষ্টি, জীবনের যা কিছু সব কেমন দিক ভ্রষ্ট।

ভাববাদ

বিভিন্নকালে দেশের নানান দার্শনিক মতবাদ সমস্ত জীবন, জগৎকে প্রাণিত করেছে। আমরা প্রধান প্রধান দার্শনিক মতবাদগুলির নিরিখে পাঠ্যক্রমকে বিশ্লেষণ করব। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে **ভাববাদ (Idealism)** একটি বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে। এই দর্শন অনুসারে জগতের **অস্তিত্বের** কোনো নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) নেই। **বস্তুর জ্ঞান নির্ভর করে মানব মনের ওপর।** সত্য, শিব এবং সুন্দর (Truth, Goodness and Beauty) **চিরন্তন, সনাতন**। মানুষের দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মন্ অবিনাশী। ভাববাদে গুরুত্ব পায় সমাজ, তার পরে ব্যক্তি-মানুষ। সমাজ সংরক্ষণ ও সামাজিক ঐতিহ্য সঞ্চালন এই ভাবধারা প্রভাবিত লক্ষ্য। তাই মানববিদ্যা (Humanities), নান্দনিক

বস্তুবাদ

বিদ্যা, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিদ্যা পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ বিদ্যা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি সমাজের রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা সংরক্ষণে ও সঞ্চালনে সহায়ক। সেই জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণে জ্ঞানমূলক, বুদ্ধিকেন্দ্রিক, অনুভূতি-সাপেক্ষ বিদ্যাচর্চার তাগিদ লক্ষ করা গেছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষায় ভাববাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের **Kant, Hegel, Schopenhauer, Santayana** প্রমুখ দার্শনিকরাও মূলত ভাববাদী। জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক হার্বার্ট ও ফ্রয়েবেলের শিক্ষা চিন্তায় ভাববাদের প্রাধান্য। এই ভাবনার বিপরীতে জন্ম নিল **বস্তুবাদ (Realism)**। এই মতবাদ অনুযায়ী বস্তুর অস্তিত্ব মানব মন নিরপেক্ষে। তাই পাঠ্যক্রমে জায়গা পেল ব্যক্তি-মানুষের বিকাশের জন্য বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, অঙ্ক, সামাজিক নানা পেশাভিত্তিক বিষয়, সঙ্গীত, কলা, মানুষের আগ্রহ-প্রসূত নানা কর্মকাণ্ড। জ্ঞান ও কর্মকে সমন্বিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বস্তু-বাদী দার্শনিকরা। এরই ফসল পরবর্তী আন্দোলন, তা হল **প্রকৃতিবাদী** (Naturalistic)।

প্রকৃতিবাদ

প্রকৃতিবাদ আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা হলেন **ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো**। তিনি মুক্ত মানুষের সমাজ তৈরি করতে চাইলেন। তাই শিশুকে সমাজ-এর নিগড় থেকে মুক্ত করে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় দিলেন। এই মতানুসারে **শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রাকৃতিক জীবন-সমৃদ্ধ একটি পূর্ণ ব্যক্তি-মানুষ তৈরি করা। তাই পাঠ্যক্রম তৈরির মূল কেন্দ্রে থাকবে ব্যক্তি-শিশু, কিশোর, বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষার্থী। জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তি-শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা, রুচি, আগ্রহ, ইত্যাদির সর্বাঙ্গীণ বিকাশোপযোগী নানা কর্মকাণ্ড, বিষয় বিন্যস্ত হবে শিশুর যথার্থ পরিণমন** (maturity) এলে। শিক্ষা তার জীবন-প্রক্রিয়া, তাই বাস্তব অভিজ্ঞতাই হবে তার পাঠ্যক্রম। সে শিখবে নৈসর্গিক প্রকৃতির কোলে, প্রথাবিমুক্ত হয়ে ও মনের মুক্ত অঙ্গনে।

রুশোর পথ অনুসরণ করলেন **পেস্তালৎসী, ফ্রেডারিক হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল, হার্বার্ট স্পেনসার, জন ডিউই** এবং **মাদাম মন্তেসরি প্রভৃতি**। ভারতীয় ভাবধারায় এর প্রতিফলন দেখা গেল। **রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী সকলেই** সমাজ-সচেতন পূর্ণ একটি ব্যক্তি-মানুষ তৈরিকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে নির্ণয় করলেন। পাঠ্যক্রম ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠবে—এই মত পোষণ করতেন সকলে। **গণতান্ত্রিক মতাদর্শে** গঠিত পাঠ্যক্রমে থাকতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজকর্ম—বৌদ্ধিক, মানসিক, দৈহিক, সামাজিক, নৈতিক, নান্দনিক, সৃজনমূলক ও আত্মিক। মানবিকী বিদ্যা, প্রয়োগমূলক বিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, ব্যবসা—বাণিজ্য, পেশাভিত্তিক সবদিককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে। শুধু কী পড়তে হবে তাই নয়, কেমন করে পড়ানো হবে— তাও মানবিক, গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠ্যক্রম রচনার একটি আবশ্যিক অংশ হবে।

পাঠ্যক্রম রচনায় **মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব** বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদ সাম্য-স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্বনির্ভর শোষণমুক্ত একটি সমাজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী

মার্কসীয় দর্শন

দর্শনে **(Dialectical Materialism)** উৎপাদন-ভিত্তিক, কর্মকেন্দ্রিক ও সমাজ কল্যাণকর পাঠ্যক্রম রচনার কথা বলা হয়েছে। তাই পাঠ্যক্রম জ্ঞান ও কর্মকে সমন্বিত করতে সহায়তা করেছে।

প্রয়োগবাদ

প্রয়োগবাদ-দর্শন-নির্ভর শিক্ষার লক্ষ্যেও তত্ত্ব ও প্রয়োগের জ্ঞান ও কর্মের, ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়নের কথাই ঘোষিত হয়েছে। এখানে গণতান্ত্রিক আদর্শ মূল্যবান বলে চিহ্নিত হয়েছে। তাই সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির ও সমাজের উপযোগী বাস্তব সমস্ত অভিজ্ঞতাকে নির্ভর করেই পাঠ্যক্রম রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

অস্তিবাদ

অস্তিবাদী দর্শন (Existentialism) ব্যক্তির অস্তিত্বকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই পাঠ্যক্রম পুরোপুরি ব্যক্তির জীবন-নির্ভর। সেখানে আগে থেকে তৈরি করা কোনো জ্ঞান-কর্ম সমন্বিত পাঠ্যক্রম বা বিষয়ের মূল্য খুব কম।

আজ **উত্তর-আধুনিক দর্শন (Post-Modern Philosophy)** মানুষকে কোনো বিশেষ তত্ত্বের বা মতবাদের পিঞ্জরে বন্দী করতে চাইছে না। সদা-পরিবর্তনশীল জীবন জগতে মানুষের ভাবনা দোলাচলে সে নিজের প্রয়োজন অনুসারেই শিখবে। সবই যে ভাঙছে প্রতিটি মুহূর্তে। কথা বলা ও লেখার মধ্যেই অনেক তফাত হয়ে যাচ্ছে। তাই দেরিদার বিনির্মাণ তত্ত্বের **(Philosophy of Deconstructionism)** প্রভাবে পাঠ্যক্রম রচনার অর্থটাই তো পুরোপুরি অন্য মাত্রা নেবে। যাই হোক সমস্ত দার্শনিক মতবাদগুলির বিশ্লেষণে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ব্যক্তি ও তার জীবন মৌলিক (authentic) এবং ব্যক্তির জীবনের জন্যই সমাজ-তাই সমাজ ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। অবশ্যই পরিবর্তনশীলতাকে সামনে রেখে।

(গ) পাঠ্যক্রমের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি (Psychological Foundation of Curriculum)

বস্তুবাদী মনোতত্ত্ব

মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দার্শনিক ভাবনার প্রভাবে শিক্ষা ও তার উপকরণ নতুন নতুন ভাবে পরিবেশিত হয়-এর সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচন করেছি। এখন শিক্ষায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে। তা হল মনস্তাত্ত্বিক দিক। মনোবিজ্ঞান **শিক্ষার লক্ষ্যে, উপকরণে, পদ্ধতিতে, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায়, শিক্ষকের কাজে শুধু** পথ **প্রদর্শন** নয়, **পরিচালনার কাজও করে। সপ্তদশ শতক** থেকে আজ পর্যন্ত মনোবিজ্ঞান সদর্থকভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে। ফলে পাঠ্যক্রমে মনস্তত্ত্বের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। **মোরাভিয়ান Sense-realist** কমেনিয়াস **প্রথম** শিশুর ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার কথা বললেন। অষ্টাদশ শতক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ধারার অব্যাহত গতি প্রত্যক্ষ করল। **রুশো প্রকৃতিবাদে** শিশুর মানসিক জগৎকে অপরিসীম মূল্য দিলেন—সুষ্ঠ

প্রকৃতিবাদ

হার্বার্ট
জন ডিউই
শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

দেহ গঠন ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষা সমস্ত বাধা থেকে মুক্ত শিক্ষার লক্ষ্য হল। রুশোর ভাবশিষ্য পেস্তালৎসি শিক্ষায় মনস্তত্ত্বকে প্রয়োগ করলেন (" I wish to psychologise education and Instruction')। পাঠ্যক্রমে, পদ্ধতিতে, শিক্ষক শিক্ষণে তিনি মনোবিজ্ঞান সম্মত নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে অনুসরণ করে দেখালেন যে মনোবিজ্ঞান সত্যিই শিক্ষাকে সার্থক করে তোলে। **ফ্রেডারিক হার্বার্ট** শিক্ষা-পদ্ধতিকে নতুন মাত্রা যোগ করলেন। তিনি দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাকে সমন্বিত করলেন। শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পঞ্চসোপান (**five formal steps of learning and teaching**) **ফ্রেডারিক হার্বার্টের** অবদানের সাক্ষী হয়ে রইল। ফ্রয়েবেলের কিন্ডারগার্টেন পরিকল্পনা, মন্তেসরির বিদ্যালয়, জন ডিউইর ল্যাবোরেটরি স্কুল মনস্তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষার উদাহরণ হয়ে রয়েছে। এরা আত্মশিখন (Auto education) নীতিতে কর্মের মধ্যে দিয়ে শিশুর সমস্ত চাহিদা পূরণ করে (fulfilment of all the needs of the child), শিশুর প্রবণতা, সামর্থ্য, রুচি, আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি রচনা করলেন এবং এই ভাবে মনস্তত্ত্বকে শিক্ষার বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখালেন। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও সমন্বয়িত বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে পৌঁছে দিতে গেলে **ব্যক্তি শিক্ষার্থীর আচরণ, তার বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথ বিকাশ,** তার **ব্যক্তি-মূলক বৈষম্যকে** গুরুত্ব দান শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আধুনিক শিক্ষা জগতে নানা গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে মানুষের মন পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। **Thorndike, Pavlov** এবং গেষ্টল্টবাদীরা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে শিশুর প্রচেষ্টা ও ভ্রম পদ্ধতিতে (Trial and Error) শেখে, এবং তার শিক্ষা প্রতিবর্তিত (conditioned) হয় এবং সে যা কিছু শেখে পূর্ণ ভাবে (as a whole) শেখে। **Sigmund Freud তার গবেষণায় মনের গঠনটিকে বিশ্লেষণ করে তার তিনটি স্তরে কথা বলেছেন**—চেতন, প্রাক্‌চেতন ও অবচেতন (conscious, pre-conscious and unconscious) চেতন মনে অবচেতন মনের প্রভাব পরে এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করেছেন। তাই চেতন মনটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অবচেতন মনটিকেও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বুদ্ধি (Intelligence) মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। তাই সে শ্রেষ্ঠ জীব। সেই বুদ্ধি বিশ্লেষণ করেছেন নানা মনোবিজ্ঞানী, যেমন, **Spearman, Thorndike, Thurstone** প্রভৃতি। **Binet-Simon scale** -এ ধরা পড়েছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বুদ্ধির প্রভেদ। তাই ব্যক্তির নানা চাহিদার পরিতৃপ্তিতে মনস্তত্ত্ব নির্ভর পাঠ্যক্রম রচনা আবশ্যিক। ব্যক্তি বৈষম্যকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রমকে বিচিত্রধর্মী হতে হবে। এর জন্য কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।সেগুলি হল—

বুদ্ধি

চাহিদা
লক্ষ্য
বিষয়
বস্তু
সংগঠন

১। চাহিদার চিহ্নিত করণ (Diagnosis of needs)
২। লক্ষ্য নির্ধারণ (formulation of objectives)

৩। বিষয়বস্তু নির্বাচন (Selection of contents)
৪। বিষয়বস্তুগুলির সংগঠন (Organisation of Contents)
৫। শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাগুলির নির্বাচন (selection of learning experiences)
৬। মূল্যায়নের বিষয় ও তার পদ্ধতি নির্বাচন (Determination of what to evaluate and the ways and means of doing it)

মূল্যায়নের বিষয়

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পাঠ্যক্রম কখনই শুধু তাত্ত্বিক (theoretical) হবে না। ব্যক্তির জীবন ও কর্মপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে পাঠ্যক্রম কর্মকেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতা ও চাহিদা-ভিত্তিক হবে। এই প্রসঙ্গে পেস্তালৎসির উক্তিটি উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন—'পাঠ্যক্রমে যেটি থাকা বিশেষ প্রয়োজন, তাই থাকে না।' (**'we lack most what we need most)**। ব্যক্তির জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে—কৈশোরে, বাল্যে, বয়ঃসন্ধিতে, যৌবনে—বিচিত্র পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে তার সঙ্গতিবিধান করতে হয়। এই প্রক্রিয়া কত বিশেষ প্রয়োজন, চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য (**demands needs and characteristics**) জীবন পরিক্রমার পথে হাজির হয়। শিক্ষা তার পাঠ্যক্রম রচনায় ও উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি-বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানে ও সমাজতত্ত্বে আধুনিক গবেষণা এই চাহিদা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছে। Prescott তিন ধরনের চাহিদার উল্লেখ করেছেন, যেমন—

জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর

(১) শারীরিক ও মানসিক,
(২) সামাজিক,
(৩) ব্যক্তিত্ব বিকাশ প্রক্রিয়ায় সমন্বয়ের চাহিদা।

প্রথম শ্রেণীর চাহিদা হল— খাদ্য, বিশ্রাম, আত্মস্বীকৃতি ইত্যাদির প্রয়োজন। **দ্বিতীয় শ্রেণীর চাহিদা হল** —সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা। সামাজিক মেলামেশার **মধ্যে দিয়ে সমাজে ব্যক্তি,** তার ভূমিকা কী এবং জীবনের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব কেমন সে সম্পর্কে সচেতন হয়। **তৃতীয় চাহিদা হল ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য ব্যক্তির প্রয়োজনীয় কিছু গুণ ও জীবন অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অবস্থা**, যার মধ্যে দিয়ে সে সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে।

চাহিদা

এই চাহিদাগুলি চরিতার্থ না হলে পাঠ্যক্রম অর্থহীন হয়ে পড়ে।

শিক্ষার লক্ষ্য অনুসারে পাঠ্যক্রম গড়ে উঠবে—এ তো **পাঠ্যক্রম রচনার প্রাথমিক শর্ত**। তাই সুসমন্বিত ব্যক্তি ও সমাজ নির্মাণ যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহলে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক প্রয়োজনগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়াও এগুলিকে ভিত্তি করে অগ্রসর হবে।

লক্ষ্য

ব্যক্তির **বৌদ্ধিক দিক** যেমন গড়ে তুলতে হবে, তেমনি **প্রাক্ষোভিক জীবনের** ভারসাম্য গড়ে তোলার জন্য প্রক্ষোভগুলিকে সমন্বিত করে বাঞ্ছিত সেন্টিমেন্ট বিকাশে **শিক্ষার উপকরণ** ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে চরিত্র গঠিত হবে।

প্রক্ষোভ

শিক্ষার্থীর জন্মগত গুণ ও পরিবেশকে সমন্বিত করে তাকে সমাজোপযোগী সুগঠিত ব্যক্তি করে তোলার জন্যে পাঠ্যক্রমে বৌদ্ধিক, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নান্দনিক সমস্ত বিষয় ও কার্যাবলীকে একটি সুসামঞ্জস্য পূর্ণ ও সুসংহত রূপ দিতে হবে। উপরন্তু, একটি উপযুক্ত মনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠ্যক্রম শিক্ষার প্রসার ও গভীরতার (breadth and depth) মধ্যে একটি সামঞ্জস্য গড়ে তোলার উপযোগী হবে। **১৯২০ সালে Ryle** জ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করেছেন—

কী জানা (Knowing what) এবং **কেমন করে জানা** (knowing how)। নতুন জ্ঞান আহরণ কী জানার মধ্যে পড়ে। আর **চিন্তা করা ও জানার কৌশল** (skill) 'কেমন করে জানার অন্তর্ভুক্ত। পাঠ্যক্রম তাই শুধু বিষয়বস্তু নয়, বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীর কাছে পরিবেশন করার কৌশলও বটে। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষণ পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এখন শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। **শিক্ষণ পরিবেশে শিক্ষার্থীকে বস্তু (object) থেকে অমূর্ত ধারণায় (abstract idea), পরিচিত থেকে অপরিচিতে, জানা থেকে অজানায় নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় নানা উপকরণ (audio-visual aids)** ব্যবহৃত করে পাঠ্যক্রমকে সজীব করে তোলা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করা সহজ হয়ে ওঠে। এখন শেখা মানে তথ্য মুখস্থ করা নয়, তাকে জানার ও বোধির স্তরে নিয়ে যাওয়ার। একে বলা হয় Metacognitive process। শিখন পদ্ধতিতে নানান মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায় বা কলা কৌশল যুক্ত হয়েছে। যেমন, **Micro teaching, Interaction Analysis, Programmed learning** ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা ও শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের নিজেদের প্রতিক্রিয়া ও আচরণের পরিবর্তন বিষয়ে অবহিত হন। তাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম যুক্ত করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে বিষয় ও পদ্ধতির সঙ্গে।

পদ্ধতি

(ঘ) পাঠ্যক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি
(Sociological Foundation of Curriculum)

Percy Nunnবললেন—'প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্যে এমন শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে তোলা উচিত যাতে প্রতিটি ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিচিত্র সমাজ পরিস্থিতিতে তার মৌলিক অবদানের স্বাক্ষর রাখতে পারে'— (Educational efforts must be limited to securing for everyone the conditions underwhich indivituality is completely developed, that is to enabling him to make his original contribution to the variegated whole of human life as full and truly characteristic as his nature permits)

শিক্ষা সমাজতত্ত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অভিযোজন

সংস্থা

আধুনিক পাঠ্যক্রম

শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া, সমাজের, সংস্কৃতির বিবিধ পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন প্রক্রিয়া—শিক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য এমনই বাস্তবে একটু অনুধাবন করলেই ধরা পড়ে যে শিক্ষার্থী জন্ম মুহূর্ত থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত, নানান সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। পরিবার, বিদ্যালয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা, রাষ্ট্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্লাব ইত্যাদির অবদানেই শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ। তা ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন দূরদর্শন, সংবাদপত্র, বেতার, সিনেমা, এগুলিও সমাজেরই ফসল। শিক্ষার্থী শিক্ষার প্রধানতম ও প্রথম উপাদান। সে সমাজেরই সৃষ্টি, সামাজিক রীতিনীতি, অভ্যাস ইত্যাদি নিয়েই সে বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস বলে—সমাজ সংরক্ষণের জন্যেই বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও গড়ে ওঠা। সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সঞ্চালনই বিদ্যালয়ের কাজ। পাঠ্যক্রম শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঠ্যক্রমের আধুনিক অর্থ শুধু পুঁথিপড়া বা তথ্য তত্ত্বের পরোক্ষ আহরণে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীর জীবন অভিজ্ঞতা, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা (educational) সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা কার্যকলাপ ও সমাজ অগ্রগতির পথে নানাবিধ নিত্য নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার ইত্যাদির নিরিখেই। নিত্য নতুন পাঠসূচী, বিষয়সমূহ, শিক্ষণীয় ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতাগুলির নির্বাচন ও বিন্যাস ও সেগুলিকে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপনাকেই আধুনিক পাঠ্যক্রম বলা হয়। সমাজতত্ত্ব পূর্ণ বিকশিত, কল্যাণকর, গণতান্ত্রিক, উৎপাদনশীল, প্রগতিশীল সমাজ নির্মিতির লক্ষ্যে সামাজিক শিক্ষার ও সমাজের নানান চাহিদা, আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণমূলক পাঠ্যক্রমের নির্দেশনা দিয়েছে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, নানা সাংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে সাংস্কৃত্যায়ন, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির প্রক্রিয়ার স্রোতেই শিক্ষাধারার উদ্ভাবন। আজ মানুষের পরিধি শুধু নিজের পরিচিত অঞ্চল বা সমাজ নয়, সে ও তার শিক্ষার বিস্তার বিশ্বায়িত। বিশ্বনাগরিকত্ব (World citizenship) আধুনিক মানুষের পরিচয়। তাই পাঠ্যক্রম সব সময় সমাজ-সংস্কৃতির সংরক্ষণ সঞ্চালনের হাতিয়ার হবে। সামাজিক অগ্রগতিমুখী, পরিবর্তনশীল, গণতান্ত্রিক ও উৎপাদনশীল ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হবে। তাই প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই যথার্থই শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক ভাবে গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর ল্যাবোরেটরি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সমাজ-পরিবেশে। তাঁর রচিত পাঠ্যক্রমে যেমন শিক্ষার্থীর জীবনের আবশ্যিক দিকগুলি (first essentials) মর্যাদা পেয়েছিল, তেমনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি, যেমন ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, নানা কার্যাবলী, নান্দনিক ও সৃজনধর্মী বিষয়ের সমন্বয় গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁর সমস্যামূলক পদ্ধতিতে (problem method) শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলির মধ্যে থেকেই সমস্যা নির্বাচন করত ও ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে সামাজিক পরিবেশে সমস্যাগুলির সমাধানে ব্রতী হত ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জ্ঞান প্রয়োগ করে মূল্যায়ন করত। এই problem method থেকেই জন্ম হল project method-এর।

সামাজিক পদ্ধতি

আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। **জ্ঞান-বিস্ফোরণ** (knowledge explosion) শিক্ষাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। পাঠ্যক্রমিক অভিজ্ঞতাগুলির নির্বাচন ও সংগঠন তাই অনেকখানি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্য তো আপেক্ষিক (Relative), সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা ও সামাজিক কাঠামো নিত্য পরিবর্তনশীল। তাই **পাঠ্যক্রম এমন হবে যা সামাজিক সমস্যার সমাধান করবে** এবং সামাজিক অগ্রগমনের দিক দর্শন হবে। **জ্ঞানমূলক** (Cognitive), অনুভূতিমূলক (affective) এবং কর্মমূলক (Conative) দিকগুলির সমন্বয়ে এমন একটি সুসংগঠিত পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হবে, যা ব্যক্তিত্ববিকাশে ও গণতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ, সাম্য-স্বাধীনতা-সৌভ্রাতৃত্ব সমৃদ্ধ, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, প্রগতিশীল সমাজগঠনে সহায়ক হবে। জাতীয় সংহতি, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রক্ষা সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার আদর্শ, তাই পাঠ্যক্রম রচনার নীতি একদিকে যেমন ব্যক্তি, তার অঞ্চল, রাজ্য, জাতির প্রয়োজন ও চাহিদাগুলিকে মেটাবে, তেমনি অন্যান্য জাতির প্রয়োজনের প্রতিও সমান সচেতনতার নীতি হতে হবে। সমাজের তৃণমূল স্তরে (Grass root level) শিক্ষার প্রসার ঘটানো, তৃণমূল স্তর থেকে উচ্চবিত্ত স্তর পর্যন্ত, সমস্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সামাজিক শিক্ষার কাজ।

আমাদের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, আধুনিক পাঠ্যক্রমের পরিধি আকাশ প্রমাণ বিস্তৃত। ব্যক্তি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, সমাজ প্রগতির লক্ষ্যে পাঠ্যক্রমে বঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুসংহত ও সুবিন্যস্ত রূপটিই সমাজবিজ্ঞানের অবদান—একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

পাঠ্যক্রম রচনার মূলনীতিগুলি (Principles of Curriculum Construction)

পাঠ্যক্রম এর প্রকৃতি বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট হয় যে, পাঠ্যক্রম শুধুমাত্র বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী বা বিষয়বস্তু নয়, পাঠ্যক্রম শিক্ষার লক্ষ্য, ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা—পদ্ধতিগত দিক লক্ষ্যানুসারে ও সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সংগঠন এবং পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন সব কিছু নিয়েই গড়ে ওঠে।

আজ একবিংশ শতক —বিশ্বায়নের স্পর্শে সর্বত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থিক সমস্ত দিকগুলি জুড়ে পরিবর্তনের হাওয়া, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। এই পটভূমিতে শিক্ষা তথা পাঠ্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন উঠছে— যেমন, (১) কোন্ ধরনের পাঠ্যক্রম গ্রহণ করা হবে, তা কি সাধারণ পাঠ্যক্রম, না বিশেষায়িত বিষয়গুলি (General or special subjects)?